যুগান্তর

15 JAN 2007

তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশ হিমাগারে

ডুবতে বসেছে যশোর শিক্ষা বোর্ড

যশোর ব্যুরো

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডে দুর্নীতি আর অনিয়ম শেকড় গেড়ে বসেছে। এখানে নিয়মনীতির কোন বালাই নেই বললেই চলে। দুর্নীতির বিষয়টি ওপেনসিক্রেট হলেও তা উৎপাটনে কারও উদ্যোগ নেই। চেয়ারম্যান প্রফেসর হাফিজুর রহমান মিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ব্যক্তিগতভাবে অপেক্ষাকৃত সৎ হলেও প্রশাসন পরিচালনায় তিনি ব্যর্থ। তার আমলেই যশোর বোর্ডে অরাজকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সচিব আবদুল হক মোল্লাকে বলা হয় বোর্ডের দুর্নীতির মূল হোতা। সম্প্রতি তাকে শাস্তিমূলক বদলির নির্দেশ দেয়া হলেও এখনও সচিব পদে বহাল রয়েছেন। নানা কারণে যশোর শিক্ষাবোর্ড এখন ডুবতে বসেছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, যুগান্তরসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যশোর শিক্ষাবোর্ডের দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ৩ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সম্প্রতি তদন্ত কমিটির কর্মকর্তারা শিক্ষাবোর্ডের ১৮টি বিষয়ের ওপর তদন্ত করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা দুর্নীতি ও অনিয়মের সত্যতা খুঁজে পেয়েছেন। তদন্তে বোর্ডের সাবেক বিদ্যালয় পরিদর্শক লেয়াকত পারভেজ, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক আবদুল কাদের মুন্সি ও তৎকালীন বিদ্যালয় পরিদর্শক এম ওয়াজেদ কবিরসহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, লিয়াকত পারভেজ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নামে সংশ্লিষ্ট মহলের কাছ থেকে উৎকোচসহ অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময় কলেজ ও বিদ্যালয় পরিদর্শন করলেও চেয়ারম্যানের কোন অনুমতি নেননি। এমনকি পরিদর্শন সংক্রান্ত সঠিক ও সুস্পষ্ট কোন পরিসংখ্যানও রেকর্ডে লিপিবদ্ধ নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নামে নানাভাবে তারা ঘুষ আদায় করতেন। কর্মকর্তাদের এই কর্মকাণ্ডকে আইন ও বিধির পরিপন্থী উল্লেখ করে তদন্ত কর্মকর্তারা রিপোর্টে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। তদন্ত রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সাবেক বিদ্যালয় পরিদর্শক এম ওয়াজেদ কবির চেয়ারম্যানের অনুমোদন ছাড়াই ১৮টি বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও শাখা খোলার অনুমতি দেন। তদন্ত কর্মকর্তারা এ কাজের জন্য ওয়াজেদ কবিরসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। যশোর শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ : ২০০৫ সালে ১১টি পদে ১৯ জন কর্মচারী নিয়োগের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে দেড় হাজার আবেদনপত্র জমা পড়ে। প্রত্যেক আবেদনকারীর কাছ থেকে ২০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট নেয়া হয়। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া গত এক বছরেও সম্পন্ন হয়নি। তবে বিধিবহির্ভূতভাবে সচিবের মৌখিক নির্দেশে কয়েকজনকে নিয়োগ দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে নানা অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া রেজিস্ট্রি নবায়ন, সার্টিফিকেট সংশোধন ও সনদপত্র ডাউনলোডসহ বিভিন্ন খাতে অনিয়মের ঘটনা রিপোর্টে উল্লেখ হয়। তদন্তে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের (শিক্ষা) জন্ম তারিখ, এসএসসিএ ও এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং পরবর্তীতে তার পদোন্নতির ব্যাপারে গড়মিল ধরা পড়ে। একই সঙ্গে সেকশন অফিসার আবদুল খালেককে বিধিবহির্ভূতভাবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। উচ্চমান সহকারী আজিজুর রহমান ও আবদুল জলিল এইচএসসি পাস না হওয়ায় তাদের পদোন্নতিকে অবৈধ বলে তদন্ত কর্মকর্তারা রিপোর্ট দেন। কিন্তু তদন্ত কমিটির সুপারিশ দীর্ঘদিনেও বাস্তবায়ন হয়নি। এদিকে যশোর বোর্ডের বেহাল অবস্থার জন্য সূত্র চেয়ারম্যানকে দায়ী করে বলেছে, তার ব্যর্থতার কারণেই বোর্ড ডুবতে বসেছে। সম্প্রতি তার নিজের দুই ছেলে ও ভগ্নিপতিসহ কয়েকজনকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিয়োগ দেয়ায় বোর্ডে তোলপাড় শুরু হয়েছে। একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সচিবের বদলির আদেশ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নতুন সচিবকে গত ৪ দিনেও দায়িত্ব বুঝিয়ে দেননি। উপ-পরিচালকের (হিসাব ও নিরীক্ষা) বিরুদ্ধে অভিযোগ, জামায়াতের রুকন হওয়ার সুবাদে তিনি অফিসে বসেই রাজনীতি করেন। সচিবের পরামর্শদাতা হিসেবে তিনি পরিচিত এবং দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা। আর সচিবকে বলা হয়ে থাকে দুর্নীতির মূল হোতা। এসব কারণে যশোর শিক্ষাবোর্ডে বর্তমানে হযবরল অবস্থা বিরাজ করছে। এদিকে শিক্ষাবোর্ডের অভিযুক্ত কর্মকর্তারা তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের কথা অস্বীকার করেছেন।